স্বামী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥স্বামী॥

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন করে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি করে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত করে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক নয়, দেমাক নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এক মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকি কিছু নেই, একেবারে-কিছু নেই। আঠারো, উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশি প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশি বছরের শুকনো হাড়-গোড় নিয়ে বাস করে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠতে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

BANGLADARSHAN.COM

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হল, আমার অতি-বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যে কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে সর্ব্বস্বান্ত করে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন, লজ্জাসরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই করেছিস কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু। এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদচে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস নে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার মরে বাঁচি!

কিন্তু থাক সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হল না; বড় বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী-বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চ্চনা কি বারব্রতও কোনদিন হতে দেখিনি, এ-সব তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বৈ কি? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি, কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এ-সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হচ্চে, সূর্য্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশী ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল ঠিক সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে বসে কি-সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা যা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা সুরু করে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিল।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু মা এক-একদিন ভারী গোল বাধাতেন। মুখ ভারী করে এসে বলতেন, দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হচ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজখুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি করে।

মামা আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন, বলিস কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয় নি, এর মধ্যেই তোর–সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে–

মা কাঁদ-কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি করে?

মামা হেসে বলতেন, ভাবিস নে বোন, সে-সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার করে বিড়বিড় করে বকতে বকতে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারী ভয় হত। কেমন করে যেন বুঝতে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে সুরু হয়েছিল, তা বলচি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দু'পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এতবড় মিথ্যেটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস—সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কলকাতায় সে বি.এ. পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজপি—আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticism—ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাশন। এই নিয়েই বেশীরভাগ তর্ক হত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হতো না। কিন্তু আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন বলে মনে করেন না?

BANGLADARSHAN.COM

আমি গর্ব্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য করে বলতেন, কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের মন্টিক্রিস্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হতে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এমনি তর্ক করে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাচ্চি, মা দেখতে পেয়ে বললেন, ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস, জল যে এল বলে।

আমি বললুম, জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বললেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সদু, কথা শোন্–যাসনে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা বলে দিচ্চি।

আমি বললুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের এই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ করে রইলেন। কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে মা, এমন করে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বললেন, তাই হ'ল। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝমঝম করে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি–ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে ত আমি শুনিনি।

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, সদু যে! এখানে?

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটির দিকে চেয়ে বললুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?

BANGLADARSHAN.COM

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে বসে বললে, আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচচে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বললুম, তাই বৈ কি! কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর আমি যদি ঐ কুড়ান ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?

জানিনে, কেন আমার ভয় হল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠা আমার আলগা হয়ে গিয়ে পলকে সমস্ত ফুল ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ও কি করলে?

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম, আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন না কুড়িয়ে।

এ্যাঁ! এত অভিমান! বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল, আমি জোর করে মুখ ফিরিয়ে আর–একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ করে চেয়ে থেকে বললে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজপি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে বলে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, কে রাগ করেছে?

যে ফুল ফেলে দিলে?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?

আমি ত মেঘ দেখচি।

মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না?

BANGLADARSHAN.COM

কৈ যায়? বলে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনার চোখাচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক করে হেসে বললে, একখানা আরশি থাকলে যায় কি না, দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে-চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট করে আকাশ খুঁজতে হত না।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল।

নরেন বললে, মেঘ না কাটলে ব্রজবাবুকে বলে দেব, লেখাপড়া শেখান মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।

আমি বললুম, বেশ ত, ভালই ত। আমি ও-সব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, আজকাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?

আমি বললুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?

নরেন বললে, সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্যে। নইলে পড়তুম না। বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি করবে?

বললুম, ভিজে ভিজে চলে যাব।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হত, তা হলে?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো। জিজ্ঞেস করে ফেললুম, সে দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?

নরেন বললে, একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ? পোড়া-মুখ দিয়ে তুমি বার হয়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, এর পর যদি একজন আপনি বলে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।

কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বলব না।

বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

মনে মনে রাগ করে বললুম, পোড়ামুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতেই বার করতে পারলি নে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল ক'টি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বললুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙ্গিয়ে যাব কি করে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভাল, কিন্তু একলা অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতেই যাব না। মা দেখলে—

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার করে দিই।

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণে আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপরে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েচি।

খুশী হয়ে বললুম, তাই চল–

নরেন তার চেয়েও খুশী হয়ে বললে, কেমন মিষ্টি শোনালে বল ত!

বললুম, যাও–

সে বললে, নির্ব্বিঘ্নে পার করে না দিয়ে কি আর যেতে পারি!

বললুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী নাকি?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি করেই বা মনে এল এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, দেখি, তাই যদি হতে পারি–আমি ঘেন্নায় যেন মরে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্ছে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, আমার হাত ধরে যেতে পারবে?

BANGLADARSHAN.COM

বললুম, পারব। কিন্তু তার হাত ধরে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোনমতে টাল সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ করে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝকঝক করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না?

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, কি করে?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমেষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে, আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ী চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কা-মরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল, জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভাল মেয়ে তুই সদু, এলি কি করে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলি নে?

না মা। সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম, তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিস বল ত? যা, বাড়ীর ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের যদি লজ্জাসরম একটুকু আছে!

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

BANGLADARSHAN.COM

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া, লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটছে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেচি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পনরো আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক, অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না! আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে কল্‌জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘরদোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি,

সিন্দুক, আসবাবপত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট একতলা শ্বশুরবাড়ীর কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে–

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে বস মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে নাকি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন?

BANGLADARSHAN.COM

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই এক ভায়ের বিয়ে হয়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এন্‌ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি করে উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটি গরু আছে, বিধবা বোন আছে–নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বচ্ছর! ঘটকীকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির করলেই হল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টলটল করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব!

মামা শুনে বললেন, এন্‌ট্রান্স? তবে বলে পাঠা, এখন বছর-দুই সদুর কাছে ইংরিজী পড়ে যাক, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত করো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থুতে কিছু হবে না–

মামা বললেন, তা হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, পনেরয় পা দিলে যে–মামা বললেন, তা ত দেবেই; পনের বছর বেঁচে রয়েছে যে!

মা রাগে-দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বললেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না!

মা বললেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এস না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।

মামা বললেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাব বলে চিঠি লিখে দিচ্চি।

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, এমন চোখ-কানও ছিল, যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

BANGLADARSHAN.COM

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙ্গা খুন্‌তি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে-রকম মুখের চেহারা অনেকদিন পরে আর একবার দেখেছিলুম সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল যা কখন কোনদিন পাইনি। সে বললে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চললে?

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারলুম না। বলে ফেললুম, কোথায়?

সে বললে, চিতোর।

স্পষ্ট হ'বা-মাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বললে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি; বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলতে চাই–শুনবে?

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধরে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগালনা। কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি! দেখি, তার দু'চোখ বয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্ব্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে

এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে, এখানে কেউ দেখতে পাবে।

মনে বুঝলুম, এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে বসে বললে, এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না, এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

তারপর অনেক কথাই হল, কিন্তু থাক গে সে-সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এতবড় দুর্গতিতেও কোনদিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি সর্ব্বনাশ করে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এই সবই তাঁরই নিষেধ।

BANGLADARSHAN.COM

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাশা করে গেলেন। মা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন না। বললেন, হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু বলেও মনে হল না! তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, বসে বসে আরও দু'দণ্ড আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললেন, তবে আর আপত্তি করো না দাদা, মত দাও—সদুর একটা কিনারা হয়ে যাক।

মামা বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললুম, যাক, মামা এখনো মতিস্থির করতে পারেন নি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জানত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ করে এসেছেন, সেদিন

অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সদুর সেইখানেই বিয়ে দিস। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে। অবাক কাণ্ড! কিন্তু অবাক হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, মাতাল আর মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে, যে মদ খায় না। জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়লুম অকূল পাথারে। সুখে-দুঃখে কিছুদিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পনের পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে বসে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা।

আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ করে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন, হতভাগা-মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোমরকমে মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো করে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু শুভদৃষ্টি হল না, ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্ম্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্ব্বে কতদিন সারারাত্রি জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি করে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত হল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম্ম তেমনি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্‌কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাসার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যেদিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যকও হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকী অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীসুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটি সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে পারব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী। সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে।

BANGLADARSHAN.COM

তাঁর কাজ তিনি করলেন; আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগিরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দু'জনেই জানি, তা ইশারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরী হল না, আমাকেও দু'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনিই আরামের নিশ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্রি চক্র ধরে ফোঁসফোঁস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যতপ্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধা পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারারাত্রি পড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেইদিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই বলে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিলে কি শুতে পার না?

আমি বললুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

তিনি বললেন, না হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বললুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

তিনি বললেন, ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

বললুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, এতবড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? বলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাকরী করতেন; কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আপিসের সময়ের ভাত, আপিস থেকে এলে পা-ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়ীসুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোনদিন একসঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যে ব্যতিব্যস্ত; এমন কি চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরী কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আধঘণ্টা ধরে হয়ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কারও সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যই তিনি দিবারাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এতবড় পরিশ্রমী এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি বলেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালোমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সব-তাতেই বলতেন, থাক থাক, আমার এতেই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীসুদ্ধ সকলের এতবড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগল।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোনদিন বা একটু পড়ত, কোনদিন পড়ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে বলে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ছি ছি, কি নির্লজ্জই আমাকে তা হলে এরা মনে করত! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়ামায়া না করে, আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বৈ ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে বসে মেজঠাকুরপোর জন্যে চা তৈরি করচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরী হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হত মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক করলে ঘনশ্যাম? এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক, ফিরে এসেই খাব। বলে চলে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াইবাড়ীর পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই বলে ফেললুম, কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?

তিনি একবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আনলে বৌমা?

আমি বললুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?

তিনি বললেন, ও মা, সে আবার ক'টা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাকবে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কিছু খাবার তৈরি করে দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী বললেন, বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমি ত বসে বসে সমস্ত শুনছিলে বাছা?

চুপ করে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল! স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না!

BANGLADARSHAN.COM

চুপ করে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বৌমা, ভাত বাড়া হয়েছে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, খাবে না কেন শুনি?

বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে বলে উঠলেন, বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, না?

শাশুড়ী বললেন, তাই নাকি বৌমা, বলি, এ নূতন ঢঙ্ শিখলে কোথায়?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙ্ই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?

তবু ভাল, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল! বলে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুম মা, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না!

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ-সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর একবিন্দু মিছে নয়, কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হতে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহুভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলচি, মানুষের মন-পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেইদিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এতবড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উলটো স্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

BANGLADARSHAN.COM

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্ত্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্যে কি করেচে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্যে কিনা বলতে পারিনে, ক'দিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট করে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে বসে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখলুম, স্বামী!

রাত জেগে বসে পাখার বাতাস করে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধরে ফেলে বললুম, এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

আমি বললুম, আমার মাথা ধরেচে, কে তোমাকে বললে?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি; আমি হাত গুণতে জানি। কারো মাথা ধরলেই টের পাই।

বললুম, তা হলে অন্যদিনও পেয়েচ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েচি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না কথা কবে?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।

তিনি বললেন, তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই, বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে করলুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন করে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা ধরে রাখলেন। হয়ত একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নাই!

BANGLADARSHAN.COM

তারপর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশি আর বলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ-স্মৃতি-সে আমার, একেবারে আমারই থাক।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা-কিছু সে আমি শিখে এবং শেষ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙ্গায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের উপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখলুম স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হল স্বপ্ন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ীঠাকরুণ সেইদিন থেকে আমার উপর যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেলুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতেই স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জানতুম না! তাই দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া করে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়তদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন, স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারী কুটচেন, শাশুড়ী বলে বলে দিচ্ছেন, এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অম্বলের কুটনো, এমনই সমস্তই প্রায় আঁশ-রান্না। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না।

একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হলেই তাঁর খাওয়া হত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধদিন একটু ভাল তরকারি হলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেচি।

বললুম, ওঁর জন্যে কি হচ্ছে মা?

শাশুড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বৌমা? ওর জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে বলে দিয়েচি, তার পর একটু দুধ দেব'খন।

BANGLADARSHAN.COM

বললুম, সময় নেই কেন মা?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতেই ত পাচ্ছ বৌমা! এতগুলো আঁশ-রান্না হতেই ত দশটা-এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজদেওর) দু-চার জন বন্ধুবান্ধব খাবে, তারা হল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হলে পিত্তি পড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর উপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও দেখতে হবে বাছা!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে বললুম, শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে? একটুখানি ডাল রাঁধবার কি সময় হত না?

তিনি আমার মুখের পানে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তক্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরানীগিরি করেন না বলে, কুলি-মজুর বলে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি।

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বৌমা, এতদিন তার কি করে খাওয়া হ'ত শুনি?

বললুম, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা! এখন থেকে সে-সব হতে দিতে পারব না। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল, ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পার, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি, বলে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করে স্নান করতে চলে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপধপে সাদা বিছানাটার উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এতদিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলুম।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে বলে দিল যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলাম না।

স্বামী বললেন, এখনো শোওনি যে?

BANGLADARSHAN.COM

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ির পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম—তাইত, বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখেচি।

স্বামী শয্যায় বসে একটু হেসে বললেন, আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?

বললুম, কে বললে?

তিনি বললেন, সেদিন তোমাকে ত বলেচি, আমি হাত গুণতে জানি।

বললুম, জানলে ভালই! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?

তিনি বললেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?

বললুম, অল্প? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে।

কেন, আমার অপরাধ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে, যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কে ভগবান মানে না? তুমি?

বললুম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যে বলে মানিনে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাসি মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন–

আমি মাঝখানে ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি?

আমি বললুম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী বলে উঠলেন, থাক এসব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোনদিন আর এ কথা মুখে এনো না।

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনতে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগারাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না করে এভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোশক তুলে বললেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল?

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধিল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন-তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সবচেয়ে বড় গর্ব্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবা-মাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করচি, তিনি ডেকে বললেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে?

বললুম, ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললেন, একটা কথা আমার শুনবে?

রাগে, অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি শুনিনি?

BANGLADARSHAN.COM

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা তা হলে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না, তারা বলে, কারও কাছে মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন, বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত? কি করে বললে ভগবান তুমি মান না?

হঠাৎ মনে হল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি! তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হত? আমাকে আটকে রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।

আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল; বললুম, মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্ত্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্ত্তব্য করুক?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোনদিন আর যেন মনে করে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসি নে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম, কেন, শুনতে পাইনে?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্ত্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, কর্ত্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

BANGLADARSHAN.COM

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্ত্তব্য? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ করে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হল, হায় রে! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা যে আমার কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুনলুম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বললেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বললেন, শুনেচি মা।

শাশুড়ী বললেন, তা হলে যা হোক এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বললেন, তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এতবড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু–

স্বামী বললেন, সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালোমন্দ যাই হোক, বাড়ীর বড়বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না! ও চায়, আমি একটু ভাল খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বললেন, অবাক করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালোমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা! অতবড় বৌ যেদিন এসেছে, সেই দিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙ্গল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা বড়বৌমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিয়ে যাও! বলে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি যে কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের-অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয়ত, তা হলে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাইত, বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস নি, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে তোর কপাল পুড়বে না ত পুড়বে কার? সমস্ত সন্ধ্যেবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজসজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভান করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হল! তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায় সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হত? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমিশয্যাতে না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গল, মনে হল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।

বুকের ভেতরটায় ধক করে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার করবার জন্য কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন করে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্দ্ধার কি একটা সীমা থাকতে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্য্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হল, হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আপিস করতে হবে।

মুখ নীচু করে কোনমতে বললুম, তুমি?

আমার কিছুতেই থাকবার যো নেই! রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন ফিরবে?

BANGLADARSHAN.COM

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানেই থাকতে হবে।

তা হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌ-মানুষ, শ্বশুরবাড়ীতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

স্বামী বললেন, ছি, তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ো। এই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেইদিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে বসে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না।

কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকেবেঁকে চলে যেতে দেখলে সর্ব্বাঙ্গ যেমন করে ওঠে, অথচ যতক্ষণ যেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি করে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি করে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেল, সে হঠাৎ ভারী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না?

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক–গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুসি করবার জন্যেই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারী লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে বসে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্চেন। লজ্জা করে কিন্তু কম-সম খাবেন না বাবু, তা হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে বলে দিলেন।

মানুষের শয়তানির অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি।

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা করে বললে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্চেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো-আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বলল, বাবু পান চাইলেন মা।

BANGLADARSHAN.COM

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার করতে যাননি?

কৈ না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হলে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সবচেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, একঝাড় চামেলি ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

আমি মানুষের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলুম ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'তুম–তাঁর ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্ব্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ীর সর্ব্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়ীসুদ্ধ সবাই অযত্নঅবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন করে দিতে পার না?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না!

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না। বললুম, আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো!

তাই এক-একদিন চুপ করে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোনদিন স্বামীর জোর নিয়ে আমায় অমর্য্যাদা অপমান করেন না!

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেচি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু'চক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হত, অমনি করে একটা দিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্দ্ধেক বেদনা কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খান-কয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েচে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন বেলা বয়ে গেছে, কখন দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কতদিন হিংসে পর্য্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি বলেই ভাবতে পারতুম!

কিছুদিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তা কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কতদিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বলব, কিন্তু যেই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি, না–অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাঁকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানা হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি করে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বললে, বস বলচি।

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বললে, ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্ত্তব্য ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্ব্বলতা নেই। মনে মনে ভাবতুম, এ লোকটা দেখে যাক আমার স্বামী কত বড়!

বললুম, তা হলে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?

BANGLADARSHAN.COM

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, সদু, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুনলুম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার করে বললুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি, যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে!

বললুম, তুমি ভগবান মান?

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগল, না হাঁ, না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে–কি জান!

থাক গে, তার পরে?

নরেন বলে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যেদিন শুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামে অন্যের, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্য আর কারও শয্যায় রাত্রি–

ছি ছি, চুপ কর। কিন্তু কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুনলে?

তোমাদের যে দাসী তিন-চারদিন হল বাড়ী যাবার নাম করে চলে গেছে, যে–

মুক্ত কি তোমার লোক ছিল? বলে জোর করে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেমনি সজোরে ধরে রাখলে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য কেন এতবড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনাদোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কখন না। তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা-অচেনা মুখ্যু-লোকের—

থাক, থাক, ও-কথা থাক।

নরেন চমকে উঠে বললে, আচ্ছা থাক, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত! মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসি চলে যেতে না পারে?

BANGLADARSHAN.COM

এসব কথা আমি সমস্তই জানতুম! আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকী ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলতে লাগল। বললুম, তুমি আমাকে কি করতে বল?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকুই শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্য্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু'ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ করে বসে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উলটো ধারায় বইতে দিতে এইটুকুমাত্র সময়, এইটুকুমাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হলে যেমন করে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দিতুম, কিছুতেই তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাসুদ্ধ শরগাছ যেমন করে কাঁপতে থাকে, তেমনি করে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভেতর দিয়ে পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ করে আনচে। সেদিন

মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা কর!

দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, সদু!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র! যেমন করে হোক আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি? সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

মাথার ওপর বাজ ভেঙ্গে পড়লেও বোধ করি মানুষে এমন করে চমকে ওঠে না, আমরা দু'জনে যেমন করে চমকে উঠলুম, নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

BANGLADARSHAN.COM

বললেন, বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুনতে সবদিকে বেশ হত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান! চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাত মা?

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, না, না, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ করেই ত সারতে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এ ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্চি, বাবুটির আবার ভারী লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি,—বলে তিনি ফিকে একটু মুচকে হেসে চলে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু-নীচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের উপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্ব্বাঙ্গ বয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না, আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাকতে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজকর্ম্ম করি—যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থরথর করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে? চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা উপায় কি!

অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ী ঠাকরুণ ডেকে বললেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে একমুহূর্ত্তে দেরী সইবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারারাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজজা বললেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।

বললুম, তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?

কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ করে গেলেন, বলে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়ীসুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সবচেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য-প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

BANGLADARSHAN.COM

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না! কিন্তু সে ত কোনমতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্য্যন্ত হালকা করে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি! যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যতই অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া করে তোলে। একদিন দু'দিন করে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, এতই কি দোষ করেচি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করে নির্ব্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্চেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বলচেন, ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচদিন বলে কতদিন দেরী করলি বল ত বাছা?

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

BANGLADARSHAN.COM

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হল। মুচকি হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হল, সে যেন একটুকরো জ্বলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হল তখ্‌খুনি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হলে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জ্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বসলুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা, মনে হতে লাগল তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিলবিল করে নড়ে নড়ে বেড়াচ্চে। তার পরে পড়লুম—একবার, দু'বার, তিনবার পড়লুম।

তার পরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বললে, মাঠাকরুণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোস্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচদিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

পড়ে দেখি সর্ব্বনাশ। মা লিখেচেন, শুধু রান্নাঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল কিন্তু একফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলুম জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্য্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এতবড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হতে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতে কথা কইলুম। বললুম, আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে।

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় শুনলে?

গায়ের ওপর পোস্টকার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, ধোপাকে কাপড় দিয়ে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীসুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা!

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এতবড় স্পর্দ্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষা করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খানখান হয়ে পড়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ফেলেছিলুম সদু, আমাকে মাপ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললুম, মিথ্যে কথা। তা হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শুধু দুঃখ পেতে বৈ ত না! তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পরে তোমাকে জানাব।

বললুম, কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকী নেই! তুমিই কি বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?

ওরে হতভাগী! বল্, বল্, যা মুখে আসে বলে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মানুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোনমতেই আর ফিরতে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বললুম, আমি হেঁসেলে ঢুকতে–

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার–

বললুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো রান্নাঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।

শুনে অবাক হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বললুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত? বেশ, আমি রেখেই যাব।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন সাদা হয়ে গেল। বললেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

কিন্তু এমন পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, বাঁধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। বলে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হল না, বেনারসী কাপড়-জামা প্রভৃতি যা কিছু, এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার করে টান মেরে ফেলে দিলুম।

BANGLADARSHAN.COM

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ব্বাক হয়ে বসে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয়-হয়। ঘরে গিয়ে দেখি বিছানা খালি, দু-একখানা ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়না নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানালাটার গায়ে খটখট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে, দেরী কোরো না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়ীসুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম, তখন বেলা সাড়ে আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে তখন সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হলে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখায় বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, বৌমা, কলের জল চলে যাবে, উঠে চান করে নাও।

স্নান করে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জ্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেমনি নীরবে বসে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলচি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গয়নার সর্ব্বাঙ্গ ভরে ওঠে।

হঠাৎ হাতের ভারী অনন্তটা ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাচ্চে।

সে বললে, স্বপ্ন দেখছিলে? ইস্, এ হয়েচে কি! বলে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপ্ন! একমুহূর্ত্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে বসে দেখলুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শেল। ও কি?

তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।

তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন একটু হেসে বললে, আমি ছাড়া আর কে কিনবে?

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বললে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বস্ বোন, আমি দিব্যি করচি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাইবোন। তোকে যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে করব।

চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এস নরেনদাদা। আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক! কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি মরে যাব ভাই।

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপরে বসে বললে, মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোনদিন একসঙ্গে ত–

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড়ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস ক'র না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?

বুকের ভেতরটা কে যেন দু'হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখ্খুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি ভাই। আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।

BANGLADARSHAN.COM

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না, আবার ঝরঝর করে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললে, সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মানো?

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল; বললুম, মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত করেও ফিরে যেতে চাইছি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আমি বলচি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে। বলে নরেন গম্ভীর-মুখে বসে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবছে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরী সইছিল না, বললুম, আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদাদা?

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কখ্খনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন, না-নিন সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কতবড় একটা বিশ্রী হৈচৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!

ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা এতটুকু ক'রো না নরেনদাদা! তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ কথার কি যে জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন ম্লানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই, এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

BANGLADARSHAN.COM

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্চ নাকি?

হুঁ।

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম—তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব! ওগো, আমি তাঁর দিব্যি করে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার সর্ব্বনাশ কর না।

মুখ তুলে দেখি, সে ঘরে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

ঘরে ফিরে এসে আর-একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আক ডাকচি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি দাও।

আমার সে ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কত দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাতদিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন করে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আপিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো হনহন করে চলেছে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে কারা বেশী ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সবচেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজদেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি! হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন! তার পরে, রাতদুপুরে দুটো শুকনো ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতেপোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভালমানুষ, কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

BANGLADARSHAN.COM

ওরে মহাপাতকি! এতবড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশী সংসারে কেউ কি কোনদিন করেছে? ইচ্ছে হল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ করে দিই!

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনদিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বললুম; সেইদিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় পড়ে আছে সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল বলে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ করে বলে বসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাকলে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখচি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেমনি পড়ে থাকে। অর্দ্ধেক দিন ত হাতও দেন না।

শুনে দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চলে গেলে, মুক্তকে নীচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি?

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না!

তুই ত ঘর করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হলে বুকের ভিতরটায় যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আর সবাই জানে, তুমি বাড়ী-পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি করে বাপের বাড়ী চলে গেছ। তোমার শাশুড়ীও তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি বলে রাগ করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের দুঃখ হয়। সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বৌমা!

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেল! বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ী আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয়ত সেইজন্যই আমার গয়নাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বললুম, বল্ মুক্ত, সব বল্। যত-রকমের বুকফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস নে।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্ত বললে, এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি করে?

মাস-খানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জানতুম।

তার পর?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন?

তার পর?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বৌমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বৌমা!

কেন মুক্ত?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

প্রাণপণ বলে উঠে বসে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম–না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বলতে দেব না! আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞান বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে।

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা! টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না।

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম, ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশকুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাবু আসছেন, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।

মনে মনে বললুম, ভগবান! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও, ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥